OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 173 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 173 – 180
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্ব

রিঙ্কা দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, আসাম
Email ID : rinkadey1@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Bengali Novel, Women Psychology, Psychoanalytical theory, Id, Super Ego, Frued, Karen Horney, Sociel culture, Ganjendra kumar Mitra.

Abstract

From the inception of Bengali novel, authors have strived to uncover the mysteries of the inner worlds of their male and female characters. Influenced by Western civilization, these writers have examined the psychological dimensions of men and women through various psychological theories. Bankim Chandra's early novels are among the first examples of psychological novels in Bengali literature. Later, Rabindranath Tagore achieved success in writing psychological novels, with 'Chokher Bali' being a notable example. The novels from the Kallol era and subsequent periods are regarded as particularly enriched with psychological qualities influenced by Freudian psychoanalytic theory. In the post-World War II and post-independence eras of Bengali novels, the themes centered around female psychology became more pronounced. The psychology of women and their inherent characteristics—such as love, restraint, tolerance, and maternal instincts—have been pivotal in shaping their inner worlds. Rabindranath Tagore referred to this inner world as the 'Moner Karkhan', where a woman's laughter, tears, gains and losses, desires, and envy are deeply embedded mysteries. Rapid changes over time have significantly impacted women's daily behaviors and thought processes. Under intense pressure, their thoughts and mental states sometimes become pronounced, while at other times they resonate in literature as suppressed sorrows.

The psychological differences between men and women have often been attributed to anatomical differences. It was believed that due to these anatomical reasons, women's destiny was inherently less mature and more adaptable than that of men, thus often being deemed inferior in personality. However, Karen Horney, the first female psychoanalyst, observed that male researchers in psychology had constructed female psychology based on male psychology. She was the first to analyze female psychology independently of Freud's biological determinism. Although there were female psychoanalysts before her, their theories were influenced by Freudian thought.

Modern thoughts or values impact the psychological realm of humans, playing a supportive role in the construction of character frameworks. In Gajendrakumar Mitra's novels, the influence of both Freudian psychoanalysis and Horney's theories is particularly evident in his female characters.

In several of Gajendrakumar Mitra's novels, the number of female characters exceeds that of male characters. In his analysis of female characters, he explores the diverse psychological worlds of women. The numerous female characters in his novels are realistically portrayed with psychological depth, sometimes idealistic, sometimes mysterious, sometimes base, oppressive, greedy, simple, maternal, helpless, and more.

In this research paper, an attempt has been made to analyze the psychology of the main female characters in Gajendra kumar Mitra's trilogy (Kolkatar Kachei, Upokanthe, Poush Faguner Pala); specifically, the characters Shyama, Uma, and Promila. Additionally, the psychological analysis extends to the character Indrani in the novel Prabhat Surya, the character Surbala in the novel Ami Kan Pete Roi, and the character Subhadra in the novel Adi Ache Anto Nei.

Discussion

আমরা যখন মনস্তত্ত্বের কথা বলি, সেখানে নারী পুরুষ উভয়েই কথা আসে। নারী ও পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক জগত গঠিত হয় তাদের প্রকৃতগত স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদার উপর ভিত্তি করে। তাই উভয়েরই মনস্তত্ত্বে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নারীর প্রকৃতগত স্বভাব বৈশিষ্ট্য যেমন প্রেম, সংযম, সহিষ্ণুতা ও মাতৃত্বের মনোভাব দিয়ে তার মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা একটি মানবশিশু জন্ম নেওয়ার পর থেকে পুত্রসন্তানকে পুরুষ ও কন্যাসন্তানকে নারী - এই দুই ভিন্ন অথচ নির্দিষ্ট নিয়মাবলির মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দিয়ে এসেছে। ফলে নারী ও পুরুষ শৈশব থেকে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। অথচ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই মানব সমাজে নারী পুরুষের অবস্থান পাশাপাশি ছিল। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে নারী ও পুরুষের অধিকার কিংবা অবস্থানে প্রভেদ নির্ধারিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত মূল্যবোধের ফলে নারী সমাজে মানবিকবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কঠোর বিধি নিষেধের ফলে নারীমুক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের প্রসার লাভ করে। আধুনিক সাহিত্যে এইসব আন্দোলন বিপুলভাবে প্রভাব করেছিল। বাংলা সাহিত্যের লেখক তথা ঔপন্যাসিকরা নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি তথা বিভিন্ন নারীবাদী আন্দোলনের প্রসারে অগ্রণি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা কথা সাহিত্যের পাতায় নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় নারীর মনন তথা মনস্তত্ত্বের উপর আলোকপাত করেছিলেন। নারীর অন্তর জগতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন নারীর 'মনের কারখানা' – যেখানে নারীর হাসিকান্না, পাওয়া না পাওয়া, কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-দ্বেষ, প্রভৃতি অন্তগূঢ় রহস্যের ইতিহাস চাপা পড়ে আছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের সংখ্যা বেশি লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর উপন্যাসে নারী চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে নারীর বৈচিত্রময় মনোজগতের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে যে বিপুল সংখ্যক নারী চরিত্ররা রয়েছেন, তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁরা কখনও আদর্শবাদী, কখনও রহস্যময়ী, কখনও নীচ, অত্যাচারী, লোভী, সরলা, মমতাময়ী, অসহায় ইত্যাদি বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বাস্তবসম্মত রূপ লাভ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে দুজন বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এবং সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)।

> "এই দুই বিজ্ঞানীর তত্ত্ব এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই তত্ত্বের জৈবনির্ধারণবাদী ব্যাখ্যার মধ্যে নারীকে বিবর্তনের হীনতর ফসল এবং দুর্বলতর মানব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।"[১]

ফ্রয়েডের তত্ত্বে নারী ও পুরুষের পার্থক্যগত মনস্তত্ত্বের কারণ তাদের শরীর সংস্থানগত দিক বলে দাবী করা হয়েছে। অর্থাৎ শরীর সংস্থানগত কারণেই নারীর নিয়তি নৈতিকভাবে পুরুষের চেয়ে কম পরিণত ও দুর্বলতর অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মানা হয়েছিল। যার ফলে নারী পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু ডেনাইলসন ক্যরেন হর্ণাই (১৮৮৫-১৯৫২) বিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট জার্মান নারী মনোসমীক্ষক, যিনি লক্ষ করেছিলেন মনোবিজ্ঞানের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 173 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জগতে পুরুষ গবেষকেরা পুরুষের মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই নারী মনস্তত্ত্বের কথা আলোচনা করেছেন। ক্যারেন হর্ণাই প্রথম মহিলা মনোসমীক্ষক ছিলেন যিনি ফ্রয়েডের জৈবনির্ধারণবাদের ব্যাখ্যার বিপরীতে গিয়ে নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর আগেও অনেক মনোসমীক্ষক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের তত্ত্বগুলো ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন –

> "Horney concentrated on the importantce of family and societal cultures in molding the destiny of individuals and went for beyond Freud's insistent focus on 'anatomy as destiny'. She detailed in many early and later writings the powerful impact of unclear subtle massage and forces in clearly shaping our lives."[২]

ক্যারেনের নারীর মনস্তত্ত্ব তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন –

> "She emphasized in 1920 and in her later works the importance of cultural factors on women's 'inferior position' and that what women really envy is not the penis but the superior position of men in society"[৩]

পরবর্তীকালে ক্যারেন হর্ণাইয়ের পথ ধরে অনেক বিজ্ঞানীরা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব ও গুরুত্ব যথেষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নতুন নতুন তত্ত্ব আধুনিক সাহিত্যে গ্রহণযোগত্যা লাভ করার ফলে নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো তাঁদের চরিত্রের কাঠামো নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠে। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্যারেন হর্ণাইয়ের সাইকোআন্যালিষ্টিক তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। তৎসঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ বা মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

সাধারণত মানুষের মন, তার আনন্দ বেদনা, উৎসাহ- সংশয়, প্রত্যয়-হতাশাকে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। 'ঘটনাপরম্পরার বিবরণ' দিয়ে চরিত্রের 'আঁতের কথা' উন্মোচনে প্রয়াসী হন। নারী মনের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ বিচিত্র দিকগুলোকে গজেন্দ্রকুমার তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন নারী চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ট্রিলজির [কলকাতার কাছেই (১৯৫৭), উপকণ্ঠে (১৯৬১), পৌষ ফাগুনের পালা (১৯৬৪)] প্রধান নারী চরিত্র শ্যামা। শ্যামা তার ভবঘুরে সংসারবিচ্ছিন্ন স্বামী নরেনের গৃহে এসে অভাব, নির্যাতন আর লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই পায়নি। স্বামী থেকে ভালোবাসা দূর, স্ত্রী হিসাবে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদাও শ্যামা পায়নি। রাতের অন্ধকারে জুলুম করে শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করে পরদিন সকালে উধাও হয়ে যাওয়ার মতো অত্যাচারকে প্রতিদিন সহ্য করে এসেছিল। দারিদ্রপীড়িত সংসারে একের পর এক সন্তানের দায়িত্বের বোঝা শ্যামা বহন করে এসেছিল। কিন্তু নরেনের মুখে যেদিন পতিতাগৃহে রাত কাটানোর কথা শুনেছে সেদিন শ্যামার মনের গতির এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে। পুরুষশাষিত সমাজে আগেকারদিনে স্ত্রী স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্যায়ভুক্ত ছিল বলেই শয্যাকক্ষে তার আহ্বান পুরুষের মর্জি ও মেজাজের উপর নির্ভর করত। কিন্তু সেইরাতে শ্যামা নরেনের আহ্বানকে প্রথমবার প্রত্যাখান করে নিঃশব্দ প্রতিবাদের জবানিতে জানিয়েছিল—

> "শ্যামার কঠিন ও মৃদু কণ্ঠস্বর যেন চমকে দেয় নরেনকে, 'নইলে অদৃষ্টে দুঃখ আছে, এই তো? কী করবে তুমি মারবে? বেশি করে মারতে পারবে? বঁটি এনে দিলে গলায় বসিয়ে দিতে পারবে? দ্যাখো, একটা কথাও বলব না, কাঁদব না পর্যন্ত, কেউ টের পাবে না।"[৪]

শ্যামার শান্ত অথচ কঠিন স্বর এর পূর্বে নরেন কখনও শুনেনি। নরেনের থেকে প্রাপ্ত শারিরীক ও মানসিক অত্যাচারকে শ্যামা মুখ বুজে সহ্য করে এসেছিল। কিন্তু স্বামীর পতিতাগৃহে আমোদের কথা জানার সঙ্গেই শ্যামার ধৈর্যের বাঁধন ছিঁড়ে যায়। ভীত কণ্ঠে নরেন জিজ্ঞেস করে,

"তুমি আমার ঘর করবে না নাকি?"[৫]

শ্যামা চাইলেই নরেনের সংসার ত্যাগ করতে পারতো, কিন্তু তার আজন্ম সংস্কার ও শিক্ষা তাকে অনুমতি দেয়নি বলেই শ্যামা জানিয়েছে—

"করতে তো হবেই! আজ রাতটা আমাকে অব্যাহতি দাও।"[৬]

শ্যামা নববিকশিত পদ্মের মতো রূপসী তার অন্তরের আবেশের থরথর বাসনার দীপটি জ্বালিয়ে বসে থাকতো, সেই স্বামী তার কাছে না এসে রূপোপজীবিনীদের ঘরে গিয়ে কুৎসিত ব্যাধিতে নিজ স্বাস্থ্য ও যৌবন লাবন্য নষ্ট করে ফেলে শুধুমাত্র দেহের প্রয়োজন মেটাতে, যার শুধু ক্লেদের প্রতি আকর্ষণ, শ্যামার চোখে সেই স্বামী পশু থেকেও অধম স্তরে নেমে আসে। শ্যামার জীবনের সমস্ত দুঃখের মূল তার স্বামী নরেন। তাই নরেনের ব্যবহারে শ্যামা রাগ করেছে, তাকে গালমন্দ দিয়েছে, এমনকি একদিন গালে চড়ও কষিয়েছে, কিন্তু পরমুহূর্তে তার স্নেহশীলা মন জননীর মতোই স্বামীর সমস্ত দোষকে ঢেকে দিতে চেয়েছে। যেন কোনো অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের সঙ্গে নরেনের হয়ে শ্যামা মনে মনে তর্ক করে মনের ভিতর নরেনের দোষ স্খালনের চেষ্টা করেছে। শ্যামা নরেনের সকল দোষ ক্ষমা করে দেয়, যখন তাকে নির্জন দুর্যোগের রাতে সন্তানদের নিয়ে একা থাকতে হয়। যাকে নারীর পুরুষের প্রতি থাকা স্বাভাবিক কামনা বাসনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উপন্যাসে শ্যামার অবদমিত কামনার বর্ণনা রয়েছে —

> "সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই – এত দুঃখের মূল যে, সেই স্বামীর ওপর শ্যামার রাগ যত হয় তার চেয়ে ঢের বেশি মন কেমন করে। এক একটা দুর্যোগের রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে ওর যেন রাত আর কাটে না। ওর সেই বলিষ্ট সুন্দর স্বামী! কোথায় আছে কি করছে, কে জানে! ...শুয়ে শুয়ে ভাবত স্বামীর কথা। সেই সময় ওর নিজের দুঃখের একটি কথাও মনে পড়ত না। অন্তরের সমস্ত বর্ষণ চলত একটি মাত্র লোককে কেন্দ্র করে।"[৭]

এক্ষেত্রে শ্যামা চরিত্রের মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েড ও হরনাইয়ের তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

শ্যামার উমার স্বামী শরত ফুলশয্যার রাতে তাকে রক্ষিতা গোলাপী সঙ্গে ভালোবাসার কথা জানায়। মা দয়াময়ীর জ্বালাতনে সে সুধুমাত্র উমাকে বিয়ে করেছে, তাই তাকে স্ত্রীর মর্যাদা শরত কখনই দিতে পারবে না। দায়িত্ব গ্রহনে অপারগ স্বামী এবং শাশুড়ির অত্যাচারে উমা কলকাতায় মা রাসমণির বাড়িতে ফিরে আসে। শ্যামার দুঃখের ইতিহাস শুনে উমার চোখে জল আসে কিন্তু সেই অশ্রু সমবেদনার নয়, সেই অশ্রু ঈর্ষার। কারণ শ্যামা তার দারিদ্রপীড়িত জীবনে যা পেয়েছে, উমা তা না পেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। দুই বোনের মনস্তত্ত্বের বর্ণনা ট্রিলজির আকর্ষণীয় বিষয়। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> "উমা শোনে আর মধ্যে মধ্যে তার বুক চিরে এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। শ্যামা মনে করে সেটা তার দুঃখের সমবেদনায়— কিন্তু উমা অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তা নয়— যেটা পেয়ে শ্যামার দুঃখ, সেটা না পেয়েই উমার দীর্ঘশ্বাস! এমনই হয় জীবনে। আমার কাছে যা দৈন্য তা হয়ত তোমার কাছে ঐশ্বর্য। পৃথিবীর সব অভাবই তাই আপেক্ষিক। যা মানুষ বেদনার ছবি দেখে সামনে, সে নিজের বেদনায় সান্ত্বনা পায় সহজে।"[৮]

উমার এই এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়, সে উপলব্ধি করে যে কারুর মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনিও যে ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। এ নিজে না অনুভব করলে যেন উমা কখনোই বিশ্বাস করতো না। উমা অনুভব করে শ্যামা তার স্বামীর কাছ থেকে প্রতিনিয়ত শারীরিক এবং মানসিক আঘাত পায়, কিন্তু তাতে অনেকটা 'পাওয়া' আছে। উমার রূপবান মিষ্টভাষী স্বামী যে, যেকোনো মেয়েরই কামনা করার মতো; তাঁর কাছে থেকে উমাকে পরিপূর্ণ কৈশোরের সমস্ত কামনা ও অনুরাগের ডালি নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে, তাঁর রূপ-যৌবন শরতকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। তাই উমার মনে হয়েছে এমন নিষ্ঠুর স্বামী

থেকে নরেনের মতো পশু হলেও তার জীবন-যৌবন সার্থকতা পেতো। স্বামী সঙ্গসুখের জন্য উমা যেন সকল আঘাতকে সানন্দে সহ্য করতে পারতো।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ট্রিলজির অন্যতম নারী চরিত্র প্রমীলার মধ্যে এক বিচিত্র মনোভাব ফুটে উঠেছে। প্রমীলা বিধিদত্ত সজাত পরোয়ানা নিয়ে এই সংসারে এসেছিল। কর্তৃত্ব করার তাঁর যেন সহজ অধিকার। ছোটো দেওর দুর্গাপদর সঙ্গে প্রমীলার অবৈধ সম্পর্কের কথা বাড়ির সকলে জানলেও তার মুখের উপর বলার সাহস কারুর ছিল না। প্রমীলার স্বামী অম্বিকাপদ এক নির্বিকার চিত্তের মানুষ। স্ত্রীর এইসব কর্মকাণ্ডের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। প্রমীলা শুধু রূপ নয়, তার কর্তৃত্ববোধ ও সাংসারিক জ্ঞান বুদ্ধিতে বাড়ির অভিভাবক অভয়পদর মন জয় করে নিয়েছিল। কারণ –

> "চেহেরা অবস্য তাঁর খারাপ নয়, কিন্তু পুরুষ রূপের চেয়ে অনেক বেশি আকৃষ্ট হয় মেয়েদের বুদ্ধির দীপ্তিতে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়। প্রমীলার বেলাতেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি।"[৯]

দুর্গাপদ বিয়ে না করতে চাইলে প্রমীলা তাদের সম্পর্ক এখানেই সেষ করার হুমকি দিয়ে তাকে বিয়েতে রাজী করিয়েছিল। দুর্গাপদর বিয়ের প্রসঙ্গে প্রমীলা শাশুড়ি ও বড়ো জা মহাশ্বেতাকে সম্পূর্ণ পিছনে ফেলে নিজেই গিন্নি হয়ে বসেছিল। বাড়ির কারুর মতামত না নিয়েই দুর্গাপদর সঙ্গে তরলার বিয়ের পাকাকথা দিয়ে এসেছিল। সুন্দরী বউ পেয়ে যাতে তার প্রতি দুর্গাপদর আকর্ষণ কমে না যায় তাই জেনে বুঝে প্রমীলা কালো গাত্রবর্ণের পাত্রী তরলাকে একা গিয়ে নির্বাচন করে এনেছিল। প্রমীলার এই মনস্তত্ত্বের কথাকে ঔপন্যাসিক পিঁটকী নাম্নী চরিত্রের সংলাপে ফুটিয়ে তুলেছেন—

> "ওলো ইচ্ছে ক'রে কালো মেয়ে আনছে, বুঝলি? পাছে সোন্দর মেয়ে এলে ওর থেকে সোহাগ কমে যায়— এই ভয়ে!"[১০]

দুর্গাপদকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মানসিকতা প্রমীলার অন্তরে এতোই প্রবল ছিল যে, বর-কনের ফুলশয্যার রাতে দেওর ও ভাজের সঙ্গে মস্করা করার ছলে তাদের মাঝে এসে ঘুমিয়ে পড়তেও প্রমীলা কুণ্ঠিত হয়নি। বাড়ির ছোটো বউ তরলা। মেজো জা প্রমীলার অপ্রত্যাশিত ব্যবহার সেদিন তরলাকে বেদনার থেকে বেশি বিস্মিত করেছিল। কারণ পনেরো বছরের জীবনে তরলা বহু মেয়ের বহু ফুলশয্যার বিবরণ শুনেছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ঘটা অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে কোনোটাকেই মিলাতে পারেনি। তাঁর ট্রিলজিতে যে কয়েকটি খুব কম সময়ের জন্য চিত্রিত করেছেন। তাদের মধ্যে তরলা একটি অন্যতম চরিত্র। কুরূপা তরলাকে দুর্গাপদ বিবাহের পর থেকে দীর্ঘদিন অবহেলা করে এসেছিল। দুর্গাপদ প্রমীলার ছলা-কলার অধীনস্থ ছিল। দুর্গাপদ তরলাকে কখনোই জীবনসঙ্গিনী করবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর বহুকাল সন্দেহ ছিল শুধুমাত্র দৈহিক আকর্ষণবশত তরলাকে শয্যাসঙ্গিনী করেছিল। প্রমীলার সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তরলা নিজ অদৃষ্টকে দায়ী করেছে। এছাড়া তার কাছে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু এই নিয়ে তরলা একটি কথাও কাউকে বলে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেনি। ভাশুর পুত্র বুড়োর নতুন স্ত্রী তড়িৎ-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অসভ্য ও অশালীন আচরণের কথা একদিন প্রমীলা তরলাকে ডেকে এনে প্রত্যক্ষ করেছিল। প্রমীলা শুধুমাত্র দুর্গাপদ জব্দ করার জন্যই সেদিন তরলাকে ডেকে এনেছিল। দুর্গাপদ ভেবেছিল তরলা দু-চারদিন রাগ অভিমান করে থাকবে, কিন্তু স্বাভাবিক আচরণ দেখে দুর্গাপদ শুধু বিস্মিত নয়, ভয় পেয়েও যায়। যাকে দীর্ঘদিন অবহেলার পাত্রী ভেবে এসেছিল, তার সামান্য মনোযোগ পাওয়াটাও দুর্গাপদর কাছে আরাধানার বিষয় হয়ে ওঠে। অনেক সাধ্য সাধনার শেষে দুর্গাপদ তরলাকে থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে, অন্ত্যত স্বাভাবিকভাবে তরলা মুখ খুলেছিল। তরলার সংক্ষিপ্ত ও নিঃসঙ্কোচ উত্তর দুর্গাপদকে চমকে দেয়। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> "দোষ আমার অদৃষ্টের — সেইটের বড়, মানুষের দোষ ধরতে গেলে আমার বাপ-মায়ের দোষ, তোমার বৌদিদের দোষ। আমার মতো কালো কুচ্ছিতকে এনে তোমার পাশে দাঁড় করানোই উচিত হয়নি তাঁদের। রূপের আশ মেটেনি বলেই ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াতে হয়— যেখানে সেখানে হ্যাংলা বিত্তি করতে যাও। ...আগে থেকেই করেছিলে, মেজদি জানতেনও— জেনে-শুনে তাঁর রূপে গুণে যে মজেছ, তার বৌ ক'রে আমাকে আনা উচিত হয়নি। হয়ত ইচ্ছে ক'রেই এনেছেন, তুমি চিরদিন হাতে থাকবে বলেই— কিন্তু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 173 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> আমিও তো মানুষ, আমার কাছে আমার জীবনের, আমার সুখ-দুঃখের দাম আছে। সেটা উনি ভেবে দেখতে পারতেন। কালো কুচ্ছিত বলে স্বামীর ভাগ ছেড়ে দেব— এটা ভাবা ওঁদের উচিত হয়নি।”[১১]

‘প্রভাত সূর্য্য’ (১৯৪৫) উপন্যাসের ভরকেন্দ্রে রয়েছে ইন্দ্রাণী চরিত্রটি। শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশের দ্বিতীয়দিনে ইন্দ্রাণীর স্বামী রমাপদকে জেলে যেতে হয়েছিল। রমানাথ জেলে যাওয়ার আগে বন্ধু যতীনকে তার অবর্তমানে বাড়ির দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল। সেইসময় ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যতীনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সঙ্গীহীন জীবনে ইন্দ্রাণী যতীনের শারীরিক আকর্ষণে গা ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তে তার পাপবোধ তাকে দগ্ধ করে। জেল থেকে ফিরে আসার দিন বাড়ির সকলে রমানাথ ও ইন্দ্রাণীর ফুলশয্যার আয়োজন করে। সেই ফুলশয্যার রাতে ইন্দ্রাণী রমানাথকে তার পদস্খলনের কথা জানিয়ে দিয়েছিল—

> “আ-আপনি আমাকে ছোঁবেন না! ... আমার হয়তো আত্মহত্যা করাই উচিত ছিল, কিন্তু পারিনি। এখন যদি আপনি হুকুম দেন তো তাই করিব।”[১২]

এক্ষেত্রে দেখা যায় ইন্দ্রাণী রমানাথকে ঠকাতে পারতো। কিন্তু তার শিক্ষা ও বিবেকবোধ তাকে এই গর্হিত কাজের কথা প্রকাশে বাধ্য করেছে। ইন্দ্রাণী চরিত্রটি ফ্রয়েডের লিবিডো এবং মনোবিকলন তত্ত্ব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ফ্রয়েডের মতে লিবিডো মানুশের সকল কারযের নিয়ন্ত্রক। ফ্রয়েড মানব মন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন, তার অন্যতম একটি হচ্ছে super ego বা অধিশাস্তা - যা id বা অদস-এর একেবারে বিপরীতদিকে অবস্থান করে। এই super ego যা মূলত মানব মনের নৈতিক দিকটিকে উপস্থাপিত করে।এই উপাদানটি মানব মনের ভুল-ত্রুটি বিশ্লেষণ করে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। আর তাই ইন্দ্রাণীর মন ভবিষ্যতের ফল জানা সত্ত্বেও রমানাথকে তার স্খলনের ইতিহাস জানিয়ে দিয়েছিল।

নারী মনস্তত্ত্বের বিচিত্র মনোভাব ফুটে উঠেছে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘আদি আছে অন্ত নেই’ (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র বিনুর প্রতি বিবাহিত রমণী সুভদ্রার আকর্ষণজনিত ভালোবাসা তাকে বিচলিত করেছিল। সুভদ্রা ও বাবুর ভাড়া বাড়িতে থাকাকালীন বিনুর শান্ত স্বভাব ও হাস্যকৌতুক প্রবণতায় তার প্রতি সুভদ্রার আকর্ষণ বেড়ে ওঠে। তিন সন্তানের জননী এবং স্বামী নিয়ে তার সুখের সংসার। কিন্তু সুভদ্রার মনের অবদমিত কামনার পরিচয় পাওয়া যায় বিনুকে নিজের বানানো আলুর খাওয়াবার প্রসঙ্গে—

> “না, যা বলেছি তাই। কেটেই নিতে হবে দাঁতে। ছিঁড়ে নিয়ে তুমি জিভে লাগা দিকটা নেবে, আর ভাববে আমি সেই জেনেই এত ফন্দী করছি। তা হবে না না’। এই বলে ওর উদ্যত হাতটা টেনে সরিয়ে দিয়ে আলুর বরাটা প্রায় বিনুর মুখে গুঁজে দিলেন।”[১৩]

ঔপন্যাসিক সুভদ্রার মনস্তত্ত্বে লিবিডোর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। বিনুর জ্বরের খবর নিতে এসে সুভদ্রা তার নির্জন কক্ষে অসুস্থ অচৈতন্য বিনুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন —

> “এ অবস্থায় কপালে জলপটি দিয়ে হাওয়া করাই উচিত ছিল, কিন্তু সে কথা তাঁর মনে এল না একবারও। তাঁর দুচোখ দিয়ে তখন অবিরল ধারে জল ঝরে দুই গাল বেয়ে বোধ হয় বুকও ভাসতে শুরু করেছে। তিনি ওর পাশে আধশোয়া করে বসে ওকে জড়িয়ে কপালে নিজের গালটা রেখে তাপটা বোঝবার চেষ্টা করলেন।”[১৪]

সুভদ্রা চরিত্রে ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের id বা অদস উপাদান লক্ষ করা যায়। Id বা অদস মানব মনের মধ্যে অবস্থিত অনৈতিক বা স্বার্থান্বেষী চিন্তার চালিকাশক্তি। যা সুভদ্রার মনে অবস্থানুযায়ী ভোগ বা লালসাকে জাগিয়ে তুলেছিল। সুভদ্রা বিনুকে শারিরীকভাবে কামনা করে আত্মতুষ্টি লাভ করতে চেয়েছিল। তাই তাঁর মনে সেদিন কোনো দ্বিধা কাজ করেনি—

> “সুভদ্রা আর দ্বিধা করলেন না। সংকোচের কোনো কারণ আছে, তাও তাঁর মাথায় গেল না বোধ হয়। তিনি একেবারে ওর মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।”[১৫]

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'আমি কান পেতে রই' (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের সুরবালা চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক আত্মঅহংকারবোধ, বাসনার মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসটি সুরবালার আত্মজীবনী। সুরবালার অসামান্য রূপ যৌবন ও গানের গলা সর্বমনোহারিণী। এই গলা নিয়ে সুরবালা বিশিষ্ট মুজরোওয়ালি মতিবিবির দলের একজন অন্যতম সেরা মুজরোওয়ালি হয়ে উঠেছিল। তার মা নিস্তারিণী কোনোদিনও মেয়ের মুজরো করআকে সমর্থন করেননি। তিনি চেয়েছিলেন মেয়েকে নিজের জাতের সম্ভ্রান্ত কোনো বাড়িতে বিয়ে দেবেন। কিন্তু সুরবালার জন্ম ইতিহাস সেই পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়ের মুজরোর ব্যবসার প্রসারে ফলে নিস্তারিণী আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পান এবং মেয়ের মুজরো করাকে মেনে নিয়েছিলেন। আত্মমুগ্ধ সুরবালা মুজরোর ব্যবসায় নামলেও কোনো পুরুষের কাছে নিজেকে ধরা দেয়নি। শারিরীক সূচিতা বজায় রাখার পিছনে ছিল সুরবালার স্বজাত্যাভিমানের অহংকার। কিন্তু একদিন রাজাবাবুর প্রেমে পড়ে সুরবালা তার সর্বস্ব সমর্পণ করে। পরিবার, মান-যশ-অর্থ ত্যাগ করে রাজাবাবুর আহ্বানে চলে যায়। রাজাবাবুর সংসারে সুরবালা রাজরাণীর মতো নতুন সংসার সাজায়, কিন্তু ধীরে ধীরে সুরবালা উপলব্ধি করে সে রাজাবাবুর রক্ষিতা বা উপপত্নি ছাড়া কিছুই নয়। রাজাবাবু তাকে পুনরায় গানের আসরে যেতে বললে সুরবালা জানায় যে, ভগবানের চরণে গান বাধা দেওয়ার জন্য সে আর জীবনেও গান গাইতে পারবে না।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসের নারী চরিত্ররা নিয়তির দ্বারা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত। ভাগ্যের বিড়ম্বনা থেকে সুরবালাও নিস্তার পায়নি। সুরবালার জীবনের একমাত্র আশ্রয় রাজাবাবুর অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাকে আগের জীবনে ফিরে আসতে হয়। নিস্তারিণী, থিয়েটারের নানুবাবু ও কিরণবাবুর একান্ত অনুরোধে সুরবালা গানের আসরে নেমেছিল। সেখানে গিয়ে তার অহমবোধে আগাত লাগে এবং সুরবালা সম্পূর্ণভাবে গান ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গানের আসরে সুরবালার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বর্ণনা ঔপন্যাসিক দিয়েছেন—

> "অথচ এখানে এসে সঙের মতো বসে থাকা যায় না। বহু কৌতূহলী দৃষ্টি তার ওপর। চিকের মধ্যে মেয়েরা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে পরস্পরকে- তা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে সে। এতকাল পরে গাইতে এসেছে- রাজাবাবুর মেয়ে মানুষ, আবার সেই আসরে নামতে হল, রাণীগিরির দেমাক আর রইল না, আবার হয়তো কোন বড়লোক ধরার ফিকিরে বেরিয়েছে গাইতে- এই ধরনের মন্তব্য করছে হয়তো। অন্তত সুরবালা; দৃষ্টি বার বার ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল অপমানে আর একটা অকারণ অভিমানে।"[১৬]

সেই আসরে রাজাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু তারক দত্ত সুরবালার প্রতি কামাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার মন ক্রোধ ও ঘৃণায় ভরে ওঠে এবং সুরবালা সম্পূর্ণভাবে এই জীবন ছেড়ে বৃন্দাবনে কিশোরিমোহনের শ্রীচরণে শেষ জীবন কাটাবে বলে রাজাবাবুর দেওয়া সম্পত্তি ও গয়না বিক্রি করে বৃন্দাবন যাত্রা করে। সুরবালার জন্য নিবেদিত প্রাণ কিরণবাবু স্বেচ্ছায় ঘর-সংসার ত্যাগ করে সুরবালার সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন। সুরবালা কিরণবাবুকে এই শর্তে সঙ্গে নিয়েছিলেন যে তিনি কোনোদিনও সুরবালাকে শারিরীকভাবে আকর্ষণ করবেন না। কিরণবাবু তার শর্তের অটুট পালন করে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনের জীবনে সুরবালা কিরণের উপর নিতান্ত সামান্য ও তুচ্ছ কারণে নির্ভরশীল হয়ে ওঠেছিল। সুরবালার নির্ভরশীল হওয়াটা তার অভ্যাসের অঙ্গীভূত হয়র দাঁড়ায়। দুয়ের মধ্যে এক আত্মিক যোগ স্থাপন হলেও সেই আত্মিক যোগ কোনোদিন দৈহিক যোগে পৌঁছাতে পারেনি। অল্প বয়সে সুরবালার কোনো অসুখ করেনি বলে সামান্য অসুখেই সে কাতর হয়ে পড়তো। সেই সময় এক শয্যায় ঘুমোতেও তাঁদের কোনো লজ্জাবোধ হতো না। ঝিয়ের সেবা সুরবালার পছন্দ নয় বলে সবই কিরণবাবুর দায়িত্ব ছিল। ঔপন্যাসিক তাঁদের মনস্তত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছন—

> "দেহের কোনো স্থানেই হাত দিতে বাধা নেই, দিতে হয়েছেও বারবার, তবু স্পর্শ কখনও কামাতুর হয়ে ওঠেনি। সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করেনি কিরণ একদিনও- এক মুহূর্তের জন্যেও। করলেও হয়তো সুরবালা বরদাস্ত করতো না। কিন্তু ও-তরফ থেকে আভাসে ইঙ্গিতেও কোনদিন সে ঈপ্সা প্রকাশ না পাওয়াতে এক বিচিত্র কারণে যেন ক্ষুন্ন হয়েছে। প্রত্যাখান করার দৃঢ়তা দেখানোর সুযোগ না পাওয়ার জন্যেই বোধ হয়।কে জানে। হয়তো বা আরও গূঢ় কোন কারণ ছিল মনের অবচেতনে- যা অনুমান করতেও সাহস হয়নি সুরবালার।"[১৭]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 173 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শেষ জীবনে সুরবালা সব হারিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করার ভঙ্গিতে তার মনস্তত্ত্বের দিকগুলো আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে, ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> “অহংকার বৈকি! এই অহংকারেই মাকে কষ্ট দিয়েছি, মাসিকে আঘাত দিয়েছি। অথচ কোনটাই রাখতে পারিনি। ...ঠাকুরকেই কি পেলুম? কই, সেই বিশ্বাস- সেভাবে চিন্তা করি, কিরণকে দেখি। এখনও রাস্তা দিয়ে ফুটফুটে ছেলে যেতে দেখলে হাহাকার করে ওঠে মন। ...পয়সার লোভ- তাই বা গেছে কোথায়? মিছিমিছি কতকগুলো লোক-দেখানো ভড়ং করেছি শুধু। পয়সা ঠেলে চলে এসেছি- বাহবা কুড়ানোর লোভে। এখনও তো সব যক্ষির মতো আগলে রাখি- কি করে একটা আধটা বাঁচাব তার চিন্তা করি।”[১৮]

গজেন্দ্রকুমার এই উপন্যাসে নায়িকা সুরবালার যৌবনের আত্মমুগ্ধতা ও বার্ধক্যে আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার অতলস্পর্শী মনের রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, শশীভূষণ ‘আচার্য ফ্রয়েড ও আমরা’, ভারতবর্ষ পত্রিকা, কলকাতা, ১৩৪৫ আশ্বিন, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ৫০৪
২. ‘Women Beyond Freud’ Editor Milton M. Berger and M.D Brunner, Mazel Publisher’s, Newyork, 1994, introduction page no. ix
৩. ‘Karen Horney: The Theorist in Psychoanalysis and Feminine Psychology’ Psychology of Women Quarterly, Vol. 5, Agnes and O. Connell, Human Press, p. 81
৪. রায়, সবিতেন্দ্র ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা), ‘গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী’, খণ্ড-১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ২৭০
৫. তদেব, পৃ. ২৭১
৬. তদেব
৭. তদেব, পৃ. ২৫৭
৮. তদেব, পৃ. ২৯০
৯. রায়, সবিতেন্দ্র ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা), ‘গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী’, খণ্ড-২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ১২৫
১০. তদেব, পৃ. ১৩৩
১১. রায়, সবিতেন্দ্র ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা), ‘গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী’, খণ্ড-৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৫, পৃ. ৩৬২
১২. রায়, সবিতেন্দ্র ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা), ‘গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী’, খণ্ড-১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪০১ মাঘ, পৃ. ১৭৯
১৩. রায়, সবিতেন্দ্র ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা), ‘গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী’, খণ্ড-৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ পৃ. ৩০৫
১৪. তদেব, পৃ. ৩১২
১৫. তদেব
১৬. রায়, সবিতেন্দ্র ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা), ‘গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী’, খণ্ড-৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৮ আশ্বিন, পৃ. ৩৪০
১৭. তদেব, পৃ. ৩৮১
১৮. তদেব, পৃ. ৩৯০